Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 84 – 90
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

অম্বিকা হালদার
এম. এ, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : ambikahalder1994@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Partition, Riot, Communalism, Battle of Life, Indipendence, Religion, Secularism.

Abstract
The Partition of Bengal in 1947, part of the Partition of India, divided the British Indian Bengal Province along the Radcliffe Line between the Dominion of India and the Dominion of Pakistan. The Bengali Hindu-majority West Bengal became a state of India, and the Bengali Muslim-majority East Bengal (now Bangladesh) became a province of Pakistan. On 20 June 1947, the Bengal Legislative Assembly met to decide the future of the Bengal Province, as between being a United Bengal within India or Pakistan or divided into East Bengal and West Bengal as the home lands for the Bengali Muslims and the Bengali Hindus respectively. At the preliminary joint session, the assembly decided by 120-90 that it should remain united if it joined the new Constituent Assembly of Pakistan. Later, a separate meeting of legislators from West Bengal decided by 58-21 that the province should be partitioned and that West Bengal should join the existing Constituent Assembly of India. In another separate meeting of legislators from East Bengal, it was decided by 106-35 that the province should not be partitioned and by 107-34 that East Bengal should join Pakistan in the event of Partition. The Partition of Bengal in 1947 divided Bengal into the two separate entities of West Bengal belonging to India, and East Bengal belonging to Pakistan. This was part of the Partition of India into the two states, of India and Pakistan which officially took place during August 14-August 15, 1947. East Bengal was renamed East Pakistan, and later became the independent nation of Bangladesh after the Bangladesh Liberation War of 1971. The government of Bengal supported a unified, independent Bengal as a separate third state, rather than joining either India or Pakistan. However, the British vetoed this option since it would lead to other provinces also wanting independence, resulting in too many non-viable states. As Britain was determined to grant independence and to do so as soon as possible after the end of World War II, the government began to see partition as the quickest, most pragmatic solution. The majority of Muslims did opt to join Pakistan but wanted to take the whole province of Bengal with them. They did not choose partition. In 1971, they asserted their cultural difference from West Pakistan to become Bangladesh. Turning the two communities against each other and lighting up the fiery grudge among the society and also giving it an institutional image, by converting a united land in to different nations, was a part of this

partition. It was a brutal attack on mutual companionship. I will try to review some of the selected stories in that research paper.

Discussion

যখন একটি দেশ ভাগ হয় তখন শুধু দেশের ভেতরেই সীমারেখা টানা হয় না কারণ দেশ ভাগের ফলে আলাদা হয়ে যায় বহু পরিবার। সীমারেখা চলে আসে মানুষের সম্পর্কেও বর্ডারের সীমারেখা মানুষের মনে গভীর ক্ষত রেখে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি লাইন মনে পড়ে - '১৯৪৭ সাল ১৫ ই আগস্ট সকালে বাবা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলেছিল ভারত স্বাধীন হল আর আমরা দেশ হারালাম'। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসানে উপমহাদেশ দ্বিখন্ডিত হয় ১৯৪৭ এ। ভারত বিভাগের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এর অভিন্ন সহস্রু বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত বাঙালি জনগোষ্ঠী ও বিভাজিত হয় সম্প্রদায়গত ভিন্নতার সূত্রে। বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত বাঙালি জনগোষ্ঠী ও বিভাজিত হয় সম্প্রদায়গত ভিন্নতার সূত্রে। বাঙালির জীবনে এই বিভাজনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। সাহিত্য যেহেতু মানুষের বিচিত্র ও স্তর বহুল অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ বিশেষত ছোট গল্প সমকালের স্বপ্ন, সংকট, সংকল্প, সংঘাত ও সংগ্রামের প্রতি সংশপ্ত আপন স্বভাবধর্মেই, ফলে বাংলা ছোটগল্পের শতধা দর্পণে বিম্বিত হয়েছে দেশভাগের অনিবার্য অভিঘাত। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের সার্থক নির্মাণ। রবীন্দ্র যুগের আগে ছোট গল্প হয়নি এমন বলা যায় না তবে তা ছোট গল্পের উত্তীর্ণ কিনা এই নিয়ে নানা বিতর্ক ও সংশয় রয়েছে সাহিত্যের নবীনতম শাখা ছোট গল্প জন্ম মাত্রই বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকাশ গুণে অনন্য হয়ে ওঠে। মানুষের মনের অন্ধকার, আলো, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, জীবনবোধ, সৌন্দর্য পিপাসা, উদগ্র জীবন আকাঙ্ক্ষা, কাম, পিপাসা, অস্তিত্বের লড়াই, সমাজ, দর্শন, শ্রেণী সংগ্রাম, প্রবঞ্চনা, আত্ম প্রেরণা, প্রেম, মনস্তত্ত্ব, হৃদয়ের আরতি, হাহাকার মানবিক বিপর্যয় সবকিছুই উঠে আসে ছোটগল্পে। বাংলা গল্পের মানসিকতার জয়গান ধুঁকেধুঁকে বেঁচে থাকা জীবন কিংবা প্রেম ও কাম, বিরহ বা দর্শনের কাহিনী, চাওয়া পাওয়া, এই ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি চিরন্তন হাহাকার এই গণ্ডিবদ্ধ বিষয়গুলি প্রথম বিকট ও বিষম ধাক্কা আনে ৪৬ এর দাঙ্গা আর ৪৭ এর দেশভাগ। জাতি আর ধর্মবিভেদের নতুন একটা জগত উপমহাদেশে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন বাংলা ছোটগল্পেও রচিত হয় নতুন এক জগত, বলা যায় নতুন মাত্রা যোগ হয় বাংলা ছোটগল্পে বাংলা গল্প তার বিষয়ে ও বৈচিত্র্য বাঁক বদল করে। দেশভাগের ফলে দাঙ্গা ভয়াবহতা, নির্মমতা, নৃশংসতা, হত্যা, লুট বিদ্বেষ নিয়ে রচিত হয় অসংখ্য গল্প। উদ্বাস্তু মানুষের মিছিল, পূর্বপুরুষের ভিটা ও মাটিছাড়ার মর্মান্তিক কান্না, সর্বহারা সম্ভ্রম হারা মানুষ, রাজনীতির খেলায় খেলনায় পরিণত হওয়া মানুষই, ৪৭ ও ৪৭ এর পরবর্তী গল্প গুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। আজন্ম যে মাটির সাথে গ্রথিত জীবন যে মাটিতে মিশে আছে পূর্বপুরুষের রক্ত আর শরীরের ঘ্রাণ, শুধুমাত্র ধর্মের কারণে সে মাটি এবং রাজনীতি নেতাদের শঠতা এবং স্বার্থকে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। মানুষের মধ্যে নিয়ে আসে অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা, কি তার নাম? কি তার ধর্ম? মানুষের মধ্যে দেখা যায় আত্মপরিচয়ের জিজ্ঞাসা। উদ্বাস্তু মানুষ, ভিটে ছাড়া মানুষ, শেকড় থেকে উপড়ে ফেলা, মানুষের মর্মভেদী কান্না, মৃত্যু মানবতা এই সব কিছুর শিল্পীত উপস্থাপন ছোটগল্পকে অন্য মাত্রায় ও উচ্চতায় স্থাপন করে। এই দেশভাগের বিষয়ে নিয়ে উপমহাদেশের গল্পকার এবং কথাসাহিত্যিকরা লিখেছেন প্রচুর। সেই সব গল্পের বিষয়বস্তুতে একটা সমস্যার দেখা গেলেও ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের গল্প কারদের গল্পের উপস্থাপন এবং হাহাকারের সুরে। বর্তমান প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট এই দেশভাগের ছোটগল্পকেই কেন্দ্র করে। বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকদের দেশভাগের বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা ছোটগল্প গুলো যেন সেইসময়ের বাস্তব চিত্র গুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। দেশভাগের ফলে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, লুট, বিশেষ করে মানুষের বাস্তু হারানোর যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার আজও আমাদের মনে দুঃখ যন্ত্রণাগুলোকে জাগিয়ে তোলে। দেশভাগ এবং হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে একটি চমৎকার গল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক'। 'পালঙ্ক' গল্পের অবস্থা পণ্য গৃহস্থ্য বৃদ্ধ বিপত্নী রাজমোহন ওরফে ধলাকর্তা দেশভাগের পরও পাকিস্তান ছাড়তে রাজি হয়নি। পুত্র সুরেন সপরিবারে

কলকাতা নিবাসী হয়েছে। পুত্রবধূ চিঠি লিখে তার বাপের বাড়ি দেওয়া কারুকার্য খচিত পালনকোটি বিক্রি করে টাকা পাঠিয়ে দিতে বললে দুঃখ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রাজমহন। পুত্রবধূর বাবার বাড়ি জিনিস হলেও এটা এখন তার নিজের ঘরের সম্পত্তি, এটা কি বিক্রি করার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্মান সম্ভ্রম বিকিয়ে দেওয়া। দরিদ্র মকবুল পালঙ্ক টি কিন্তু মকবুলের গোঁ ধরে, পালঙ্ক বাজবে না, ধলাকর্তার আছে কুটবুদ্ধি। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি সংখ্যালঘু হলেও হতদরিদ্র মকবুলকে এখনো তিনি ভাতে মারার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর সঙ্গে হাত মেলায় সুবিধা ভোগী অবস্থাপন্ন মুসলমানরাও। মকবুলের কাজে ভাটা পড়ে। উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন গাই টা বিক্রি করে দেয় সে। একটা নৌকা কেনে, কিন্তু সেই নৌকা চুরি হয়ে যায় মকবুল একসময় অনুধাবন করে 'গরিবের হিন্দুস্তানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোর স্থান আছে...'। ধনী-দরিদ্রের এই অসম লড়াইয়ে মকবুল যখন পরাজিত প্রায়, ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর, স্ত্রী সন্তানদের মুখ চেয়ে পালঙ্ক বিক্রি না করে আর উপায় নেই। তখনই ধলাকর্তা এসে মকবুলের বাড়ি থেকে পালঙ্ক নিয়ে যান। সে দৃষ্টি মায়ার আর সমঝোতার। সে স্ত্রী ফাতেমাকে ডেকে বাচ্চা দুটোকে নিচে শোয়াতে বলে তৎক্ষণাৎ মন বদলে গেল রাজমহনের আপনজন হারা শূন্যপুরি আগলে রাখা নিঃসঙ্গ ধলাকর্তা যেন খুঁজে পান স্বজন। অনুভব করেন পালঙ্কের প্রকৃত কদর। দেশ বিভাগের এই স্বজন হীনতা মানুষের বোধের জায়গায় প্রবল আঘাত করে সবকিছু বদলে দিয়েছিল আভিজাত তো বোধ আর পূর্বের লালিত অনেক ধারণাকে। সবকিছু যেন একটা সামান্তরালীকরণ দেখা যায় দেশভাগের এই প্রবল ঘূর্ণিতে। যে ঘূর্ণি পাকে ধনী-দরিদ্র সবাই আক্রান্ত। কেউ বাড়িঘর ধন-সম্পদ হারিয়ে সজনহীন নিঃস্ব আবার এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে সর্বগ্রাসি খুদার কাছে ধর্ম নেই, জাত নেই, স্বজাতীয় নেই, এমনকি দেশ আর দেশ ভাগও নেই। এই ভাবেই দেশভাগের এই সব গল্পের উঠে আসে নির্মম বাস্তব আর মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

প্রফুল্ল রায় দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্প রচনায় এক দক্ষ রূপকার। তার দেশভাগ কেন্দ্রিক একটি ছোট গল্প 'রাজা যায় রাজা আসে'। এই গল্পে দেশভাগের নানা চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে দেখা যায় দেশভাগ যে কেবল দুঃখ বহন করে এনেছে তা নয় কারো কাছে তা সুখের ছিল। অর্থাৎ দেশভাগের ফলে কেউ সব হারিয়েছে আবার কেউ লাভবান হয়েছে। যদিও বা হারানোর যন্ত্রণা টাই প্রবল। কেউ তার ভিটেমাটি হারিয়েছে আবার অপরপক্ষ সেই ভিটেমাটি পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। আবার কেউ দেশভাগের পরবর্তীতে বিনিময় প্রথার পুনর্বার সহায় সম্বল হারিয়ে পথে দাঁড়িয়েছেন। 'রাজা যায় রাজা আসে' গল্পটি তেমন একটি আখ্যা নিয়ে রচিত হয়েছে। প্রফুল্ল রায়ের আরো একটি দেশভাগের গল্প 'ধুন্নিলালের লালের দুই সঙ্গী'। দেশভাগের ফলে কেবল যে হিন্দু সমাজে বিপর্যস্ত হয়েছে তা নয় সমভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ততা কিছু চোখে পড়ে, তা এই গল্পে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ধুন্নিলাল এর দুই সঙ্গী' গল্পের পটভূমি ছিল ভারতবর্ষের বিহার রাজ্য। বিহারের হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা কিভাবে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল তার চিত্র ধরা পড়ে এখানে। এই গল্পে হিন্দুরা দাঙ্গা সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত হয় আবার ধুন্নিলালের এর মত মানুষকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের রক্ষাকারী ও উপকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অধ্যাপিকা সোনালী মুখোপাধ্যায় এই গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী মানবতার মুক্ত প্রতীক ধুন্নিলাল ৪৬ সালে অখণ্ড ভারত জুড়ে যখন দাঙ্গা চলছিল তখন সাদাসিধে শহর হেকমপুরা শান্ত জীবনেও ঈষৎ উত্তেজনা আর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সংখ্যায় অধিক হিন্দুরা প্রতিবেশী মুসলিমদের অন্য নজরে দেখতে শুরু করে। হেকমপুরা থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে বারহৌলি শহরে তখন দাঙ্গা শুরু হল তখন হেকমপুরাও নিস্তেজ থাকতে পারল না। সেখানকার হিন্দুদের উত্তেজিত করার দায়িত্ব নিয়ে শাক্যদীপী গৈরীনাথে মিশ্র।"[১]

এই গল্পে নানা ভাবে ধুন্নিলালের এক স্বচ্ছ মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই গল্পের মাধ্যমে বোঝা যায় যে দেশভাগ শুধুমাত্র দুই বাংলাকেই প্রভাবিত করেনি তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী বিহার কেউ প্রভাবিত করেছিল। নিম্ন বর্গীয় মানুষের মানবিকতার প্রফুল্ল রায়ের গল্পে চিরসত্য হয়ে ধরা পড়ে। এই গল্পে ধুন্নিলালের মাধ্যমে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

স্থাপন করেছেন তিনি। তার গল্পে বাস্তবতার লক্ষ্য করা যায় বলে তিনি দেশভাগের ঐতিহাসিক ও বাস্তব রূপকার। দেশভাগের ওপর হাসান আজিজুল হকের বিখ্যাত গল্প 'আত্মজা ও একটি করবি গাছ'। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই এক দরিদ্র বৃদ্ধ পিতা ও তার কন্যাকে। করবি গাছকে প্রতীক হিসেবে এখানে দরিদ্রতার দেশভাগ, অশুচি জীবনের বিষম জীবনধারাকেই ব্যঞ্জনাময় করা হয়েছে। নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ তার কন্যাকে তুলে কিছু যুবকদের হাতে। ইনাম, ফেকু, সুহাসের এর কাছে কন্যা এই সম্ভম হানি এই দেহদানের বেদনা আর আত্ম গ্লানিতে কুরে কুরে খায় বৃদ্ধকে। করবি গাছ লাগিয়েছে বৃদ্ধ, এই করবী গাছ যেন তার আত্মজার প্রতীক। দেশভাগ মানুষকে কতটা অসহায় করেছে, বিপন্ন করেছে, নিয়তির কাছে আত্মসমর্পিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই বৃদ্ধকে দেখলে। এই গল্পের চরিত্রগুলো মূলত নিম্নবর্গের। পেটের তাগিদে বুড়ো সুহাসকে মেয়ের ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এই সুহাস নারী ভোগের জন্য বড় ভাইয়ের পকেট মারে। ফেকু বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করে। হিন্দু ইনামের টাকা নেই বলে সে নারীর কাছে যেতে পারে না। ইনাম বুড়োর কাছে গল্প শুনে গল্প তার শেষ হয় না। শীতের রাত প্রবল শীত চারিপাশে কুয়াশার চাদর গায়ে আগাগোড়া জড়িয়েও লাভ নেই তবুও বুড়ো থামেনা গল্প বলে তার দেশে আসার গল্প করবি গাছ লাগানোর গল্প আর দুচোখে দিয়ে জল পড়ে কান্না করে। বুড়ো বলে করবী গাছ লাগায় ফুলের জন্য নয়, তার বিচির জন্য চমৎকার বিষ হয়, করবি ফুলের বিচিতে এই বলে কান্না করতে থাকে। এই গল্পে দেশভাগ আর গৃহহারা ছিন্নমূল মানুষের অসহায়ত্বকে সাধারণ ভাবে তুলে ধরেছে। এই গল্প যেন একটি করবি গাছের নয় আমাদের জীবনের বিষ, ধর্মের বিষ, আর বিষ খেয়ে বেঁচে থাকা বিষাক্ত জীবনের ছবি। জীবন ধারণের যে গ্লানি তার এক মর্মন্তদ কান্না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের বিষয় উদ্বাস্তু তার অরক্ষিত মানুষ। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় কিছু উদ্বাস্তু মানুষ তারা সেখানে এসে দেখতে পায় একটি তুলসী গাছ। বোঝা যায় আগে যারা এই বাড়িতে ছিল তারা কেউ পুজো করত। কোন মমতাময়ী হয়তো যত্ন করে এই গাছটি লাগিয়েছিল। মানুষগুলো সেই মায়াবী মুক্তির কথা ভাবেন। তুলসী গাছটি অনেকদিন জল না পেয়ে প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছিল। তখন বাড়িতে যারা নতুন আসে তারা গাছটিতে পানি ঢেলে আবার গাছটিকে তাজা করেন। তারপর একদিন আবার তাদেরকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, আবার তুলসী গাছ শুকিয়ে যায়। এই ভাবেই মানবতার করুন পরিণতি মানুষে মানুষের বিভেদ, ধর্মে ধর্মে ক্লেশ, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার অসারতা বাংলা ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণতি হয়েছে। এইসব গল্পের ভেতর দিয়ে যেমন উঠে এসেছে দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র তেমনি বেজে উঠেছে মানবতার শাশ্বত সুর আর সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গোঙ্গানি। সরদার জয়েন উদ্দিনের লেখা 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা'। এই গল্পে একটি চরিত্র নিত্যানন্দ মুখুজ্জে ওরফে 'নিতাই দা' যাত্রা দলে কমিক পাঠ করে সে তার পাড়ায় দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে হাসায়, নিজেও থাকে সবসময় হাসিখুশি। নিত্যানন্দের মুখের এই হাসি যেন দেশের ভালো থাকা আর মন্দ থাকার প্রতীক। ৪৩ এ আকালের মানুষ খেতে পায় না, গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। এই দেখে নিতাই ভেঙে পড়ল তার মুখের হাসি ম্লান হয়ে যায়। তার ভয় হল, মানুষের হাসি কি চিরদিনের জন্য ফুরিয়ে গেল? সেই মহা দুর্দিনে কেটে গেল বহু কাল বহু মানুষ তাদের প্রাণ হারালো তবু দিন কেটে গেল। নিতাই ও তারপর জেগে উঠতে চাইলো কিন্তু ৪৬ এর হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা দ্বিতীয়বারের মত শুকিয়ে গেল তার হাসি। সেই সময় রাতারাতি হিন্দু মুসলমান পারস্পরের ভয়ংকর শত্রু হয়ে উঠল। মানুষের সমস্ত আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আলগা হয়ে গিয়েছে প্রাণের বাঁধন তা আর জোড়া লাগলো না। সজীব হাস্যময় প্রাণ নিতাইয়ের যেন মৃত্যু হল যে রইল সে যেন নিত্যানন্দের প্রকৃত অস্তিত্বের মমি, মৃত এক সত্তা। প্রকৃত অর্থেই মানুষের সেই বন্ধন বিশ্বাস আলগা হয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি। দেশভাগের ফলে যে ভাতৃত্ব বোধের মৃত্যু ঘটেছে, আমাদের সম্পর্ক যে প্রাণহীন মমিতে রূপান্তরিত হয়েছে তারিখ প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায় এই গল্পে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা দেশভাগের বেদনার ছবি প্রকাশিত হয়েছে 'তিতির' ও 'সীমান্ত' গল্পগুলিতে 'তিতির' গল্পে দেশভাগের যন্ত্রণাকে দেখানো হয়েছে জুলফিকার ও শুকলাল এর মাধ্যমে। আবার 'সীমান্ত' গল্পে ফজলের রবিব ও দেয়ালের মধ্য দিয়ে দেশভাগের বেদনাকে লেখক রূপায়িত করেছেন। এরা দুজন কৃষক বন্ধু আগস্ট

আন্দোলনের সহযোদ্ধ, পুলিশ মিলিটারি গুলিতে দয়াল প্রাণ হারালে তার শিশু কন্যা ফুলমণির দায়িত্ব নেয় ফজলের রবিব। কিন্তু ফুলমণির বিয়ে নিয়ে সমস্যা ও শেষ ওপার বাংলার হিন্দু কান্তারামের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফুলমনির সর্বনাশ ডেকে আনে ও নিজে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে। সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পে উঠে আসে দুই ধর্মে দুই মানুষের প্রতি মত্ত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। এখানে বাঁচার জন্য দুজনেই ডাস্টবিনের দুই প্রান্ত ধরে দাঁড়ায়। আমরা পরিচয় পাই একজন মিস্ত্রি আর একজন নৌকার মাঝি, তারপর আমরা আবার পরিচয় পাই মিস্ত্রি হিন্দু আর মাঝে মুসলমান। জীবন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে একে অপরকে অবিশ্বাস করলেও দুইজনের চোখেই সন্দেহ ঘন হয়। আবার তারা বুঝতে পারে দুইজনেরই জীবন বিপন্ন। তারা বেশি শিক্ষিত না তবু তারা প্রশ্ন করে কেন এই মৃত্যু মৃত্যু খেলা? এতে লাভ কাদের। তারপর তারা আবার মিলিত হয় একটি বিড়ি ধরিয়ে টান দেয় দুজন। আগামীকাল ঈদ, মাঝির কোমরে গোজা আছে মেয়ে আর ছেলের জন্য কেনা নতুন জামা। আট দিন ধরে সে বাসায় যেতে পারছে না, আজ তাকে যেতেই হবে চাঁদ রাতে তার ছেলে মেয়ে এই নতুন জামা দেখে খুশি হবে, তাই মাঝি এগিয়ে যেতে চায়। মিস্ত্রি র ততক্ষণে তার প্রতি গভীর মায়া জন্মে গেছে তাই সে বাধা দেয় যেতে কিন্তু মাঝির মন ছুটে গেছে, তাই চলে যায়। মিস্ত্রি বলে আদাব আবার দেখা হবে মোর ঘুরতেই মিস্ত্রি শোনে গুলির আওয়াজ। মাঝি নিশ্চয়ই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে তার কোমরে গজা ঈদের নতুন কাপড় গুলো রক্তে ভিজে গেছে, কিন্তু দুজনের এই আদাব বিনিময় ভালবাসা রয়ে যায়। এই ভাবেই রাজনীতি আর হিংসা নীতির শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের মনের ভেতর ছিল পরস্পরের প্রতি আদাব আর ভালোবাসা। দেশ বিভাগ নিয়ে প্রতিভা বসুর উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় 'দুকূলহারা' এবং 'অপরাহ্নে' শিরোনামে। দুই গল্পের বিন্দুবাসিনী দেশ বিভাগের বড় ভালোই ছিল তার ছোট তালুকা দাড়িতে বিধবা পুত্রবধূ এবং দুই নাতনিসহ, কিন্তু শোনা গেল ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট কোথা চালু হবে। আবার ভয়ের ঢেউ উঠলো সংখ্যালঘুদের মধ্যে। পাগলের মত মানুষ আবার ছুটলো সীমানা পেরিয়ে, বিন্দুবাসিনী ও চিন্তিত হলেন। বিশ্বস্ত জমির নিয়া যখন কোন ভরসার কথা শোনাতে পারল না তখন তারা দেশছাড়া সিদ্ধান্ত নিল। টাকা পয়সা সোনা দানা সব খুইয়ে মৃত প্রায় অবস্থায় হিন্দুস্তানের মাটিতে পা রাখলেন বিন্দুবাসিনীরা। যে মর্যাদার জন্য এসেছিল এক এক করে তা খোয়াতে লাগলো। খোলা মাঠে রাত কাটায় রিলিফের দুধ চিড়া গুড় কিনতে হল ভিক্ষুকের মতো হাত পেতে। সন্ন্যাসী বেশে খন্ড কেশবানন্দের খপ্পরে পড়লেন তারা। জ্বরে এক নাতনি মারা গেল, চাকরি দেবার নাম করে কেশব আনন্দ পুত্রবধূটিকে যোগ্যের আহুতি দেওয়ার জন্য নিয়ে যায়। কিশোরী সুন্দরী নাতনিটিকে দিয়ে এলো আর এক বাঘের মুখে 'বাস্তহারা বেদনা' ছবির নায়িকা হওয়ার জন্য। ওদিকে অপেক্ষা করছেন বিন্দুবাসিনী, কেশবানন্দ তাকে নিয়ে পুত্রবধূ আর নাতির সাথে দেখা করবার কথা বলে। শহর ছাড়িয়ে এক নির্জন প্রান্তে জিপ গাড়ি থেকে বিন্দুবাসিনীকে ফেলে দেয় কেশব, বিশাল এক পাথরে তার মাথা আছড়ে পড়ল, সব সমস্যা ও যন্ত্রণার নিষ্পত্তি হল। এই গল্পে একে একে নির্মম আঘাতের ক্ষত লক্ষ্য করা যায়, এই সব হচ্ছে দেশভাগের বাস্তবতা। এই গল্পে দেখানো হয়েছে কিভাবে দেশভাগ ও দাঙ্গা মানুষকে পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

অমর মিত্রের গল্পে 'দেশভাগ', এপার ওপার বাংলার মানুষের কথাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এসেছে তাদের গ্রাম ঘনিষ্ট জীবনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতা, দুঃখ তার অনুভূতির কথা তাদের স্বপ্নময় কল্পনার কথা। দেশভাগ বিষয়ক তার ছোট গল্প হল - 'দমবন্ধ' এই গল্পটি দেশভাগ পূর্ব অতীত সম্পর্কের অনুসন্ধান ও বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে এক জটিল মেরুকরণের গল্প। এই গল্পে দুই মেরুর দেখা যায় একদিকে আছে প্রভাময়ীর দেশভাগ পর্ব অতীত সম্পর্কের অনুসন্ধান ও বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে এক জটিল মেরুকরণের গল্প। এই গল্পে দুই মেরু দেখা যায় একদিকে আছে প্রভাময়ীর দেশভাগ পূর্ব অতীত সম্পর্কের উন্নত গভীর অভিনিবেশ ও গোপন অনুসন্ধিৎসা আর অন্যদিকে রয়েছে সুরেন ভদ্র ও তার স্ত্রীর বর্তমান প্রজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে খন্ডন করার দূরান্ত চালাকি অথবা কৌশল। গল্পের শুরুর ঘটনায় জানা যায় বীরেন্দ্র এসেছে বৌদি প্রভামীর কাছে তার মেয়ে বিচিত্রার বিয়ের সম্বন্ধে কথা জানাতে। এর আগে পণের কারণে বহুবার বহু সম্বন্ধ আটকেছে। অবশেষে কাগজে দেওয়া বিজ্ঞাপন অনুযায়ী পূর্ববঙ্গ

অর্থাৎ নিজেদের পূর্বপুরুষদের দেশের পাত্রই তিনি পেয়েছেন। পাত্র কৃতি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার আসানসোল পোস্টেড। বীরেন্দ্র হিসাবে লোক পাত্রপক্ষের দাবি করা ৩০ হাজার টাকা পন তার গায়ে লেগেছে প্রভাময়ী এ কথা বুঝতে পারে। বীরেন্দ্র এইদিকে সুভদ্রের সাথে তার ওপার বঙ্গের সাবেক শ্বশুরমশায়ের কিছু জীবন ভদ্রের পরিবারের কোনো লতায় পাতায় সম্পর্ক আগে আছে নাকি তা খোঁজার চেষ্টা করে, তাহলে পনির টাকা কিছুটা কম হলেও হতে পারে তার চেষ্টা। সমগ্র গল্পটিতে আছে সম্পর্কে এক অভিনব মূল্যায়ন। বিভক্তি পূর্ব ওপার বাংলা বড় পরিবারগুলো এমন আধুনিক মূল্যায়ন বাংলা সাহিত্যে এর আগে হয়নি। গল্পটি পাঠকের বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রাখে। এই গল্পটিতে দুটি দিক আছে পার্টিশন আইডেন্টিটির দিক চিহ্নবাহী দুটি পরিবার এবং এরা সকলের পার্টিশন বিচ্ছিন্ন ও অধুনা পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা বাসি উদ্বাসিত পরিবার। যে নিবিড় অতীত সত্তার পরিচয় আমাদের জীবন ও জন্ম সংলগ্ন অধিকার এমনকি আমাদের প্রজন্ম বাহিত উত্তরাধিকার ও বটে, তাকেই যখন পুনঃগঠিত সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হই তখনই সেই স্মৃতি তন্ময়তার আর কোন অর্থ থাকে না আর সেই ব্যর্থতার হাহাকার আমাদের ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়, আমাদের দমবন্ধ করে তোলে ঠিক প্রভাময়ীর মতোই। সেদিক থেকে এই গল্পের 'দমবন্ধ' নামটিও সার্থক ভাবে প্রতিকায়িত।

অমর মিত্রের অন্য একটি গল্প 'হোসেন মিঞার নাও' এই গল্পে ছড়িয়ে আছে দেশভাগজনিত বিচ্ছিন্ন তার অলীক পর্ণরেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিঞার দ্বীপের সাথে তুলনা যেমন অভিনব তেমনি সুদূর দ্বীপবাসী চম্পার সুমেরুকে লেখা চিঠিতে ভালোবাসার সাথে বিচ্ছিন্ন জীবনের বেদনাও হাহাকার বর্ণিত হয়েছে। এ বেদনা ওপার বাংলা পাঠিকা এপার বাংলার লেখক কে দেখতে না পাবার বেদনা। সুমেরুর 'সমুদ্র মঙ্গল' করে চম্পার অনুভূতি লেখক এর ভাষায়-'প্রিয় লেখক সুমেরু, তুমি যে দ্বীপের মেয়ের কথা লিখেছ তাকে তুমি কোথায় পেলে গো? হ্যাঁ আমি সেই মেয়ে, হ্যাঁ আমিও খুব বই পড়তে ভালোবাসি। কত বই, এপারের বই, ওপারের বই। ওই যে মারা গেলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তার কবিতা আমার খুব প্রিয়। তিনি যেন আমাকে নিয়ে লিখেছেন নারীর কথা,

> "এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
> এ কবিতা মধ্যরাতে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে..."[২]

মেয়েটি ওপার বাংলা এপার বাংলা লেখকের অনেক লেখাই পড়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় কিংবা শামসুর রহমান থেকে অদ্বৈতর তিতাস কিংবা ইলিয়াসের খোয়াবনামায় যার অবাধ চলাচল। তবু সবকিছুর মধ্যে বিচ্ছিন্ন বেদনার গল্পই শেষ সত্য। লেখকের ভাষায় –

> "অদ্বৈত, ওয়ালীউল্লাহ, শ্যামল, সিরাজ, সুনীল, শক্তি শামসুর, ইলিয়াস... একবার দেখি তোমাদের।"[৩]

এ গল্পের ৪৯ বছরের পাক ধরা চুলের সুমেরুর কাছে ময়না দ্বীপবাসিনী চম্পা আখতারের চিঠির আঙ্গিকে এই ভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেশভাগ পরবর্তী জীবনের স্বপ্ন ও যন্ত্রণা।

জ্যোতির্ময়ী দেবী লেখা দেশভাগের একটি গল্প 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। এই গল্পটি মূলত এক নারীর কলমে লেখা আরেক নারীর জীবন যন্ত্রণা ও সংগ্রামের কাহিনী। এই গল্পটি মূলত উপন্যাসের আকারে বড় গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র সুতারা। দেশভাগের ফলে লাঞ্ছিত জীবনের দুঃখ দারিদ্রতার গল্প। গল্পের শুরুতেই মহাভারতের কথা আছে। মহাভারতেও নারীরা যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল এখানেও তেমনি সুতারার লাঞ্ছিত জীবনের কাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। নোয়াখালীর মেয়ে সুতারা। বাবা মা দিদির সাথে ভালই জীবন কাটছিল। তার খেলার সঙ্গী একটি মুসলিম মেয়ে সাকিনার সাথে বড় হয়ে ওঠা এবং তার পথ চলা। হঠাৎ দেশভাগের ফলে রাতারাতি তার জীবন সব পরিবর্তন হয়ে যায়। পাল্টে যায় তার জীবনের মানেটাই। হিন্দু মুসলমানদের বিদ্রোহ দেখা দিল, তার মা দিদিকে ঘর থেকে টেনে এনে মারা হল। তার বাবাকে বুকে ছুরি বসিয়ে হত্যা করা হল এবং এই হত্যা করলেও কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

তমিজ উদ্দিন সাহেব সে কিনা সুতারা এর বাবার সাথে সহকর্মী ছিলেন কোন মাস্টার তিনি। সুতারাকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তার মেয়ের সাথে বড় হয়ে ওঠা সুতারার। তারপর তমেজ উদ্দিন সুতারা কে তার কলকাতায় তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম বাড়িতে ছ-মাস থাকার কারণে সুতারার দাদার বাড়িতে কেউ তার সাথে ভালো ব্যবহার করত না। সবাই তাকে অসুচি মনে করতো। সুতরাং বলে কয়ে তাকে একটা বডিং স্কুলে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল দূরে। সুতারা পড়াশোনা করে কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা হলেন। কলেজের নাম যাজ্ঞ্যসোনী কলেজ। তারপর থেকে তার জীবনটাকে দেখার ও জানার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল। সকিনার দাদা তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেই রাজি হয় না। সকিনার মা একসময় এই লড়াইকে কেন্দ্র করে বলেছিল তোমরা স্বাধীনতার জন্য মরো এবং লড়ো কিন্তু নারী কেনো নির্যাতিত হয়। সুতারার জীবনে এক নতুন ভোর হয়, তার বৌদির ভাই প্রমোদ তাকে বোঝেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। সুতারা এই প্রথমবার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাই। নদী যেমন সব নোংরা বহন করে নিয়ে আপন গতিতে বয়ে যায় সুতারাও তেমনি সমস্ত লড়াই কাটিয়ে ওঠে নিজের জীবনের নতুন দিক বা পথ খুঁজে পায়। সুতারা ছিল যাজ্ঞ্যসেনী কলেজের অধ্যাপিকা, অর্থাৎ যজ্ঞের আগুন থেকে উৎভুতা দ্রৌপদীর আরেক নাম। আর হস্তিনাপুর মহাভারতের কৌরব বর্গের রাজধানী। ইতিহাসের অর্থাৎ মহাভারতের সাথে ১৯৪৬ এর দাঙ্গার প্রেক্ষাপট এবং দেশভাগকে মিলিয়ে লেখিকা এক সুন্দর জীবনযুদ্ধে নারীর লড়াই কে তুলে ধরেছেন।

এমন আরো অসংখ্য ছোট গল্প আছে যেখানে দেশভাগ, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকরা তাদের এই দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্পে লেখকদের লেখন শৈলী র মাধ্যমে জীবন্ত বিষয়বস্তু গুলো তুলে ধরে গল্পগুলোকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে পাঠকদের কাছে। দেশভাগের পরবর্তী ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদের বেদনাতে লেখা গল্প গুলি পরবর্তী প্রজন্মের চোখ দিয়ে দেখা স্মৃতি ও স্বপ্ন সম্ভব কল্পনার এক বাস্তব রূপায়ন। এই দেশভাগ কেন্দ্রিক গল্পগুলোতে হারানো দেশ, মাটির, পরিবার, পরিজন, জন্মভূমির স্মৃতি পাঠকদের মধ্যে এক হারানো সময়কে জীবন্ত করে তোলে। গল্প গুলোর মাধ্যমে জীবনকে ফিরে দেখার এক শুভ প্রয়াস। এই গল্পগুলো বর্তমান প্রজন্মের সামনে ৪৭ এর স্বাধীনতা ও দেশভাগ এবং তার ফলস্বরূপ পরিস্থিতি গুলিকে এক মূল্যবান নথিপত্রের মতো করে সাজিয়ে তোলা কিংবা গুছিয়ে রাখা। এই দাঙ্গা দেশ ভাগ কেন্দ্রের ছোটগল্প গুলো বাংলার সাহিত্যের এবং আমাদের দেশের মূল্যবান দলিল হয়ে উঠেছে।

Reference :

১. যে অমর ‘গল্পসরনি’, প্রফুল্ল রায়ের বিশেষ সংখ্যা এবং বিংশতিতম বর্ষ বার্ষিক সংকলন : ২০১৭ কলকাতা
২৮, তদেব, পৃ. ৩৮
২. হোসেন মিঞার নাও, তদেব দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮৯
৩. তদেব দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৯২

Bibliography :

পার্টিশন সাহিত্য দেশ- কাল- স্মৃতি, মননকুমার মন্ডল (সম্পাদনা), গাঙচিল, কলকাতা।
ভাঙ্গা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য, অশ্রুকুমার সিকদার, দেশ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা।
সরকার তারক,'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশ ত্যাগ'; অরুনা প্রকাশন; ফেব্রুয়ারি, ২০০৯; কলকাতা।
মুখোপাধ্যায় সোনালি; 'প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প অনেক মানুষ'; করুণা প্রকাশনী; বইমেলা, ২০১৯, কলকাতা-৭০০০০৯।
সরকার তারক, 'বাংলা উপন্যাস ও দেশ ত্যাগ; অরুনা প্রকাশন; ফেব্রুয়ারি, ২০০৯, কলকাতা।